চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যের বরণ

প্রাচ্যে শূন্যের আগমন

অসীমের মাঝেই আছে আনন্দ। সসীমের মাঝে কোনো মজা নেই।

~ ছান্দোগ্য উপনিষদ

পশ্চিমের শূন্যের ভীতির মাঝেও প্রাচ্য শূন্যকে স্বাগত জানায়। ইউরোপে শূন্য ছিল নিগৃহীত। কিন্তু ভারতে ও পরে আরবে শূন্যের বিকাশ ঘটে। শেষবার যখন আমরা শূন্যকে দেখেছি, সেখানে শূন্য ছিল শুধুই একটি স্থানীয় মান। ব্যাবিলনীয় গণনাপদ্ধতিতে শূন্য ছিল একটি ফাঁকা দাগ। শূন্য কিছু কাজে লেগেছিল, কিন্তু নিজে কোনো সংখ্যা ছিল না। এর কোনো মান ছিল না। এর বাঁয়ের অঙ্কগুলোই একে অর্থবহ করে তুলত। নিজে একা থাকলে আক্ষরিকভাবেই এর কোনো অর্থ হত না। ভারতে এসে অবস্থা পাল্টাল।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর পারস্য বাহিনী নিয়ে ব্যাবিলন থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। এই আগ্রাসনের সময় ভারতীয় গণিতবিদরা প্রথমবারের মতো ব্যাবিলনীয় সংখ্যাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। জানতে পারে শূন্যের কথাও। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব সালে অ্যালেক্সান্ডার মারা যান। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত জেনারেলরা সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে রোম ক্ষমতায় আরোহণ করে। গ্রিস রোমের থাবায় আটকে পড়ে। তবে আলেকজান্ডার যতটা এসেছিলেন, রোমকদের ক্ষমতা ততটা পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ফলে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ও রোমের পতনের প্রভাব থেকে দূরের ভারত মুক্ত থাকল।

ভারত এরিস্টটলের প্রভাব থেকেও মুক্ত রইল। হ্যাঁ, আলেকজান্ডার এরিস্টটলের শিষ্য ছিলেন। তাঁর দর্শনও অবশ্যই নিয়ে আসেন ভারতে। তবে গ্রিক দর্শন ভারতে কখনোই সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। গ্রিসের মতো ভারতে অসীম বা শূন্যতা নিয়ে কোনো ভীতি ছিল না। বরং এখানে এ ধারণাকে বরণ করা হয়।

হিন্দু ধর্মে শূন্যতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হিন্দু ধর্মের সূচনা বহুশ্বেরবাদের ধারণা থেকে। অনেক দিক থেকেই গ্রিক রূপকথার মতো এখানেও যোদ্ধা দেবতাদের গল্প প্রচলিত আছে। তবে আলেকজান্ডারের আগমনের বহু শতাব্দী আগে থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেবতারা একীভূত হতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও দেবতাদের প্রতি ভক্তি অক্ষুন্ন থাকলেও মৌলিকভাবে এটি একেশ্বরবাদী ও অন্তর্বীক্ষণমূলক ধর্ম হয়ে গেছে। সকল দেবতা সর্বদ্রষ্টা ব্রহ্মার বিভিন্ন অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে। পশ্চিমে গ্রিকদের উত্থানের প্রায় একই সময়ে হিন্দু ধর্ম পশ্চিমা রূপকথার সাথে মিল হারাচ্ছিল। স্বতন্ত্র দেবতাদের ভূমিকা হারিয়ে যাচ্ছিল। আধ্যাত্মিক শক্তি ধর্মটায় অনুভূত হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, আধ্যাত্মিকতার উৎস প্রাচ্য।

প্রাচ্যের অনেক ধর্মের মতোই হিন্দু ধর্মে আছে দ্বৈতবাদের কথা। পাশ্চাত্যেও মাঝেমধ্যে এর উদয় ঘটেছিল। তবে এ ধরনের চিন্তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। এমন একটি বিপরীত চিন্তা হলো মানিকিজম বা মানি ধর্ম। এখানে বলা হয়, পৃথিবীটা সমান ও বিপরীত পরিমাণ ভালো ও খারাপ দ্বারা প্রভাবিত। দূরপ্রাচ্যের ইন ও ইয়াং এবং নিকটপ্রাচ্যের জরথুস্রের ভালো ও খারাপের মতো সৃষ্টি ও ধ্বংস ছিল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দেবতা শিব একইসাথে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের নায়ক। ছবিতে দেখানো হয়, তার এক হাতে সৃষ্টির ঢাক, আরেক হাতে ধ্বংসের শিখা। তবে শিব আবার শূন্যতারও প্রতিনিধিত্ব করে। এই দেবতার একটি দিক হলো নিষ্কল শিব। আক্ষ্রিকভাবে এই শিবের অর্থই হলো অংশবিহীন শিব। চূড়ান্ত ভয়েড বা শূন্যতা ও পরম নাথিংনেস। প্রাণহীনতার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তবে মহাবিশ্বের সৃষ্টিও ভয়েড বা শূন্য থেকে। যেভাবে জন্ম অসীমের। হিন্দু ধর্মে মহাবিশ্ব পাশ্চাত্যের ধারণা থেকে আলাদা ছিল। এখানে মহাবিশ্বের পরিধি অসীম। আমাদের মহাবিশ্ব পেরিয়ে আছে আরও বহু বহু মহাবিশ্ব।

ওদিকে মহাবিশ্ব আবার তার শূন্যতাকেও ভুলে যায়নি। শূন্যতা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম। আবার শূন্যতার প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়াল মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এক গল্পে মৃত্যু আত্মা সম্পর্কে শিষ্যকে বলছে, “সব প্রাণীর হৃদয়ে লুকায়িত আছে আত্মা, স্বকীয়তা। সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র, সুবিশাল মহাকাশের চেয়ে বড়।" এ আত্মা বাস করে সব জিনিসের মধ্যে। এ আত্মা মহাবিশ্বের নির্যাসের অংশ। এর নেই মৃত্যু। কেউ মারা গেলে আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়। প্রবেশ করে আরেক দেহে।১ আত্মার স্থানান্তরের মাধ্যমে মানুষটার নবজন্ম হয়। হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য হলো আত্মাকে পুনজন্মের চক্র থেকে পুরোপুরি বের করে আনা। মৃত্যুর প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে মরা থেকে প্রাণহীনতার মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের পথ হলো বাস্তবতার ভ্রম থেকে সরে আসা। দেবতার কথা হলো, “আত্মার বাড়ি দেহ। আনন্দ ও কষ্টের শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ দেহের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কখনও মুক্তি পাবে না। মুক্তির জন্য রক্ত-মাংসের চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার শূন্যতা ও নিরবতাকে গ্রহণ করতে হবে। আত্মা তখন মানবিক চাহিদা ত্যাগ করে উড়ে চলে যাবে। যোগ দিবে সম্মিলিত চেতনার সমাবেশে। যে অসীম আত্মা পুরো মহাবিশ্বে বিস্তৃত। একইসাথে যেটা সব জায়গায়, আবার কোথাও না। একইসাথে ইনফিনিটি (অসীম) ও নাথিং। এসব কারণে ভারতীয় সমাজে ভয়েড (শূন্যতা) ও ইনফিনিটির জগতে বিচরণ ছিল। স্বাভাবকভাবেই শূন্যকে তারা গ্রহণ করল।

শূন্যের পুনজন্ম

দেবতাদের একদম সূচনাকালে অস্তিত্বের জন্ম হয় অনস্তিত্ব থেকে।

-ঋগ্বেদ

ভারতীয় গণিতবিদের কাজ শূন্যকে গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা এর ভূমিকাও পালতে দিল। প্লেস হোল্ডার থেকে সংখ্যায় রূপান্তর হলো। এই পুনজন্মই শূন্যের শক্তির উৎস। ভারতীয় গণিতের উৎস সময়ের চাদরে ঢাকা। ৪৭৬ সালে রোমের পতনের বছরে লেখা একটি ভারতীয় বইয়ে গ্রিক, মিশরীয় ও গণিতের প্রভাবের কথা জানা যায়। যে প্রভাবের সূচনা অ্যালেকজান্ডার। মিশরীয়দের মতো ভারতীয়রা দড়ি দিয়ে জমির হিসাব ও মন্দিরের নকশা করত। তাদের ছিল জ্যোতির্বিদ্যারও অভিনব কৌশল। গ্রিকদের মতোই তাঁরা সূর্যের দূরত্ব বের করার চেষ্টা করেন। এর জন্য প্রয়োজন ত্রিকোণমিতি। ভারতীয় সংস্করণ সম্ভবত গ্রিকদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি থেকে ধার করা।

পঞ্চম শতকের কোনো এক সময়ে ভারতীয় গণিতবিদরা সংখ্যা লেখার পদ্ধতি পাল্টে ফেলেন। গ্রিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে তাঁরা ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তবুও ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির সাথে একটি গুরত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। ভারতীয় সংখ্যা হলো দশ-ভিত্তিক। ব্যাবিলনীয় লিখত ষাট-ভিত্তিক সংখ্যা। আমরা এখন যেসব সংখ্যা লিখি (0, 1, …, 9 দিয়ে) এগুলোর বিকাশ ঘটেছে ভারতীয়দের ব্যবহৃত চিহ্ন থেকে। এদেরকে আরবি সংখ্যা না বলে ভারতীয় সংখ্যা বলাই যথার্থ হত।

কেউ জানে না, কখন ভারতীয়রা ব্যাবিলনীয়দের মতো স্থানীয়-মান ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করে।২ হিন্দু সংখ্যার সবচেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় এক সিরিয় বিশপের লেখায়। ৬৬২ সালের তাঁর লেখায় দেখা যায়, কীভাবে ভারতীয় 'নয়টি চিহ্নের সাহায্যে' হিসাবনিকাশ করত। নয়টি, দশটি নয়। বোঝাই যাচ্ছে, জিরো এখানেই অনুপস্থিত। তবে নিশ্চিত করে তা বলা যাবে না। বিশপের এই লেখার আগেই হিন্দু সংখ্যার প্রচলন ছিল। ঐ সময়ের আগেই ভারতীয়রা শূন্যকে বিভিন্ন আকারে ব্যবহার করেছে তা প্রমাণিত। বিশপ হয়ত তা জানতেন না। দশ-ভিত্তিক সংখ্যায় প্লেস হোল্ডার হিসেবে চিহ্নের মাধ্যমে শূন্যের ব্যবহার নবম শতকের আগেই হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ততদিনে ভারতীয় গণিতবিদরা বিশাল মাইলফলক অর্জন করে ফেলেছেন।

গ্রিক জ্যামিতির অল্পই তারা ধার করেছিলেন। গ্রিকরা সমতল আকৃতিগুলোকে ভালবাসত। কিন্তু ভারতীয়দের এসবে আগ্রহ ছিল ছিল না। বর্গের কর্ণ মূলদ নাকি অমূলদ সংখ্যা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। আর্কিমিডিসের মতো কনিক বা কোণের বিভাজন নিয়েও ভাবেনি। তবে সংখ্যা নিয়ে খেলতে শিখে গিয়েছিল তারা।

সংখ্যার ভারতীয় পদ্ধতি তাদের হাতে দারুণ সব অস্ত্র তুলে দেয়। এখন অ্যাবাকাসের ব্যবহার ছাড়াই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যাচ্ছে। স্থানীয় সংখ্যা পদ্ধতির সুবাদে তারা বড় বড় সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতেন অবলীলায়। অনেকটা আমরা এখন যেমন পারি। একটু শিখে নিলেই যে কেউ ভারতীয় সংখ্যার সাহায্যে অ্যাবাকাসের চেয়ে দ্রুত গুণ করতে পারতেন। অ্যাবাকাসবাদী ও ভারতীয় সংখ্যার অ্যালগোরিস্টদের মধ্যে হত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর দিন শেষে জিতত অ্যালগোরিস্টরাই।

চিত্র ১৪: সংখ্যার বিবর্তন

ভারতীয় সংখ্যা যোগ ও গুণের মতো দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যকর হলেও এদের মূল অবদান ছিল আরও অনেক বড়। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা জ্যামিতি থেকে আলাদা হলো। সংখ্যার কাজ আর নিছক বস্তুর পরিমাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। গ্রিকদের মতো করে ভারতীয়রা বর্গ সংখ্যার মধ্যে বর্গচিত্র কল্পনা করেনি। অথবা দেখেনি দুই সংখ্যার গুণের মধ্যে আয়তক্ষেত্রকে। তারা বরং দেখেছে দুই সংখ্যার খেলা। যে সংখ্যারা জ্যামিতিক গুরুত্ব থেকে মুক্ত। আমরা এখন যাকে অ্যালজেবরা বা বীজগণিত বলি তার জন্ম এখানেই। এ ধরনের চিন্তার কারণে অবশ্য ভারতীয়রা জ্যামিতিতে খুব বেশি অবদান রাখতে পারেননি। তবে এর ছিল আরেকটি অপ্রত্যাশিত প্রভাব। এর ফলে ভারতীয়রা গ্রিকদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হন। জিরোকে প্রত্যাখ্যান করে যে সীমাবদ্ধতায় জড়িয়েছিল গ্রিকরা।

চিত্র ১৫: অ্যালগোরিস্ট বনাম অ্যাবাকাসবাদী

ফলে সংখ্যারা জ্যামিতিক তাৎপর্য থেকে মুক্তি পেল। এবার আর যোগ-বিয়োগকে জ্যামিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে না। দুই একর জমি থেকে কেতে তিন একর নেওয়া যাবে না। কিন্তু দুই থেকে তিনকে বিয়োগ করতে তো কোনো বাধা নেই। এখনকার দিনে আমরা জানি: ২ – ৩ = - ১ বা মাইনাস ১। তবে প্রাচীনকালে এ ভাবনা এত সহজ ছিল না। তারা বহু সমীকরণ সমাধান করেছেন। তবে ঋণাত্মক সমাধান পেলেই ভাবতেন এই সমাধানের কোনো বাস্তব অর্থ নেই। সহজ কথা: জ্যামিত্যিকভাবে চিন্তা করলে ঋণাত্মক ক্ষেত্রফলে কীইবা অর্থ হতে পারে! গ্রিকদের কাছে তাই এটা ছিল অর্থহীন।

ভারতীয়দের কাছে ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যাপক সমাদর পেল। আসলে ভারত ও চীনেই ঋণাত্মক সংখ্যার আবির্ভাব। সপ্তম শতকের ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত এক সংখ্যাকে আরেক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার নিয়ম বানিয়েছিলেন। নিয়মের গণ্ডির মধ্যে ছিল ঋণাত্মক সংখ্যারাও। তিনি লেখেন, "ধনাত্মককে ধনাত্মক বা ঋণাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ করলে ধনাত্মক আসে। ধনাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ করলে ঋণাত্মক হবে। ঋণাত্মককে ধনাত্মক দিয়ে ভাগ করলেও তাই।"

এসব নিয়ম আমরা আজকাল সহজেই জানি। দুই সংখ্যাকে ভাগ দিলে ধনাত্মক হবে, যদি তাদের চিহ্ন একই হয়।

২ - ৩ যেমন একটি সংখ্যা, তেমনি ২ - ২ ও সংখ্যা। এটা হলো শূন্য। অ্যাবাকাসের শূন্যতার প্রতিনিধি হিসেবে শুধুই স্থান দখলকারী প্লেস হোল্ডার নয়। বরং সংখ্যা হিসেবে শূন্য। শুধু অবস্থান নয়, এর আছে নির্দিষ্ট মান। আছে সংখ্যারেখায় একটি নির্দিষ্ট জায়গা। শূন্য সমান ২ - ২ বলে একে (২ - ১) ও (২ – ৩) এর মাঝে স্থান দিতে হবে। মানে ১ ও (-১) এর মাঝে। আর কোনো জায়গা নেই। শূন্যকে ৯-এর পরে বসানোর সুযোগ নেই। কম্পিউটার কিবোর্ডে যদিও তা করা হয়। সংখ্যারেখায় শূন্যের আছে নিজস্ব স্থান, যা তার একান্তই নিজের। দুইকে বাদ দিয়ে যেমন সংখ্যারেখা হয় না, তেমনি হয় না শূন্যকে বাদ দিয়েও। শেষ পর্যন্ত শূন্যের আগমন ঘটেছে।

তবে ভারতীয়রাও শূন্যকে খুব অদ্ভুত সংখ্যা মনে করত। কারণও আছে। শূন্যকে যেকোনো কিছু দিয়ে গুণ করলে শূন্য আসে। যেন এটি সবাইকে শোষণ করে নেয়। আর শূন্যকে দিয়ে ভাগ করতে গেলে যেন নরক গুলজার! ব্রহ্মগুপ্ত ০ ÷ ০ ও ১ ÷ ০ এর মান বের করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি লেখেন, "সাইফারকে (শূন্য) সাইফার দিয়ে ভাগ দিলে কিছুই থাকে না।" মানে তিনি মনে করতেন শূন্যকে নিজেকে দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য থাকে। তাঁর চিন্তা ভুল ছিল, যা আমরা পরে দেখব। ১ ÷ ০ কে তিনি কী ভাবতেন তা জানা নেই। কারণ তাঁর কিছু কথা অস্পষ্ট। আসলে তিনি হাত দোলাচ্ছিলেন আর আশা করছিলেন সমস্যা কেটে যাবে।

এ ভুল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভারতীয়রা বুঝলেন ১ ÷ ০ হলো অসীম। দ্বাদশ শতকের ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর লেখেন, “যে ভগ্নাংশের হর সাইফার, তা এক অসীম রাশি।" এর সাথে কিছু যোগ করলে কী হবে তাও বলেন তিনি, “বহু কিছু অজ্ঞ বা বিয়োগ করলেও এতে কোনো পরিবর্তন হবে না। ঠিক যেভাবে অসীম ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর বদলান না।"

ঈশ্বরকে পাওয়া গেল অসীমের মধ্যে। এবং শূন্যের মধ্যে।

আরবি সংখ্যা

মানুষ কি ভুলে গেছে, আমি তাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছি?

- পবিত্র কুরআন

সপ্তম শতকে রোমের পতনের সাথে সাথে পশ্চিমও প্রভাব হারাল। তবে প্রাচ্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছিল। প্রাচ্যের আরেকটি সভ্যতা ভারতকে ছাড়িয়ে গেল। পশ্চিমের তারা ডুবতে ডুবতে আরেকটি তারার উদয় ঘটল। সেটা ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শূন্যকে ভারত থেকে নিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমও ইসলাম থেকে শূন্যকে নিয়েছিল। তবে শূন্যের রাজত্ব শুরু হয়েছিল প্রাচ্যে।

৬১০ সালের এক সন্ধ্যা। চল্লিশ বছর বয়সী মুহাম্মাদ (সা) হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন। মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে, জিবরাইল (আ) এসে বললেন, "পড়ুন।" মুহাম্মাদ (সা) পড়লেন। এরপর তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। ৬৩২ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। এর এক দশকের মধ্যেই তাঁর অনুসারীরা মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য অধিকার করে। ইহুদি ও খৃষ্টানদের পবিত্র শহর জেরুজালেমের পতন হয়। ৭০০ সালের মধ্যে ইসলাম পূর্বের সিন্ধু নদী পর্যন পৌঁছে যায়। পশ্চিমে পৌঁছে আলজিয়ার্স পর্যন্ত। ৭১১ সালে মুসলমানরা স্পেন দখল করে। পৌঁছে যায় ফ্রান্স পর্যন্ত। ওদিকে প্রাচ্যে ৭৫১ সালে চীনারা পরাজিত হয়। তাদের সাম্রাজ্যে সীমানা এত বড় হয় যা খোদ আলেকজান্ডারের কাছেও অকল্পনীয় মনে হবে। চীন যাওয়ার পথে পদানত হয় ভারত। আর এখানেই আরবরা ভারতীয় সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

মুসলমানরা অল্প দিনের মধ্যেই বিজিত এলাকার মানুষের জ্ঞান আয়ত্ত্ব করে ফেলত। পণ্ডিতরা বইপত্র আরবিতে অনুবাদ করতে লাগলেন। নবম শতকে খলিফা মামুন বাগদাদে দারুল হিকমাহ বা জ্ঞানের ঘর নামে সুবিশাল এক লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। এটা প্রাচ্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল খাওয়ারিজমি।

খাওয়ারিজমি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। এর মদহ্যে আছে *আল জাবর ওয়াল মুকাবালা*। সাধারণ সমীকরণগুলোর সমাধান করার উপায় বলা আছে এখানে। *আজ জাবর* অর্থ *সম্পূর্ণ করা*। এখান থেকেই আমরা অ্যালজেবরা বা বীজগণিত শব্দটা পেয়েছি। হিন্দু সংখ্যাপদ্ধতি নিয়েও তিনি একটি বই লেখেন। এর ফলে আরব বিশ্বের মাধ্যমে সংখ্যার এ নতুন শৈলী ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। ছড়িয়ে পড়ল হিন্দু সংখ্যাকে দ্রত গুণ ও ভাগ করার নিয়মও (অ্যালগোরিদম)। আসলে অ্যালগোরিদম শব্দটা আল খোয়ারিজমির নাম থেকেই এসেছে। সংখ্যার প্রতীকগুলো আরবরা ভারত থেকে নিলেও বাকি বিশ্ব এদেরকে আরবি সংখ্যা নাম দিয়ে দিল।

জিরো শব্দটার মধ্যেই আছে হিন্দু ও আরবি ছোঁয়া। হিন্দু-আরবি সংখ্যা গ্রহণ করার সময় আরবরা শূন্যকেও গ্রহণ করে নেয়। জিরোর ভারতীয় নাম *শুনিয়া* বা *শূন্য*। যার অর্থ ফাঁকা। আরবরা একে বললেন *সিফর*। পশ্চিমের পণ্ডিতরা সহকর্মীদের কাছে একে পরিচিত করতে গিয়ে একে ল্যাটিন রূপ দান করলেন। ফলে *সিফর* হলো *জেফিরুস*। *জিরো* শব্দটার মূল এই *জেফিরুস*-ই।

নোট

১। এখানে উল্লেখিত তথ্য সব মতের মানুষের ধারণার সাথে মিলবে না। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে।

২। স্থানীয় মানের উদাহরণ: ১২ সংখ্যাটিতে দুটি অঙ্ক ১ ও ২। ২-এর স্থানীয় মান ১ ও ১-এর মান ১০। এভাবে ৪৩২-এর ক্ষেত্রে ২-এর ১, ৩-এর ১০ ও ৪-এর ১০০। স্থানীয় মান দিয়ে সব সংখ্যার মান বের করা যায়। যেমন ৪৩২ = ৪ × ১০০ + ৩ × ১০ + ২ × ১ = ৪০০ + ৩০ + ২ = ৪৩২।